জীবন হীরে-তুল্য

কিন্তু কীভাবে?

জীবন হীরে-তুল্য

কিন্তু কীভাবে?

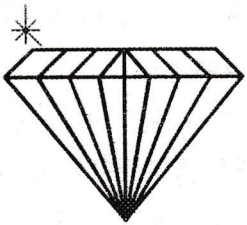

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্বাঞ্চলীয় মুখ্যালয়

১এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০২০

পরিচিতি

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় মানবগণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রসংঘের পাবলিক ইনফরমেশন বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত এবং **রাজনীতি ও প্রথাগত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত**। ইংরাজি ১৯৩৭ সালে ভারতে ইহার প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমানে সারা বিশ্বে ৮৫০০ এর বেশি রাজযোগ কেন্দ্র আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে জীবনে-ধারণকারী নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা। **কোনরূপ ধর্মান্তরীকরণ বা অনুগামী গোষ্ঠী গঠন করা নয়।** ইহা নেতৃত্ব গুণের বিকাশসাধন করতে সাহায্য করে, কোনরূপ অনুগামী করতে নয়। এখানকার ক্লাসে জাতি, ধর্ম, বয়স, সামাজিকস্তর নির্বিশেষে সকলেই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর এবং অবৈতনিক।

জীবন হীরে-তুল্য কিন্তু কীভাবে?

	বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১)	জীবন হীরে তুল্য কিন্তু কীভাবে?	৪
২)	ঈশ্বরীয় জ্ঞান, একমাত্র ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞানের উপর নিশ্চয় বোধ	৯
৩)	আদর্শ দিনচর্যার প্রতি মনোযোগ	১৬
৪)	দিব্যগুণ কী এবং ধারণের বিধি	৩৪
৫)	দৈনন্দিন জীবনে আবশ্যিক নিয়ম পালন	৫৩
৬)	দিনলিপি/দিনকৃতি	৬২

প্রকাশক ঃ

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক মুখ্যালয়

পান্ডব ভবন, মাউন্ট আবু (রাজস্থান)

জীবন হীরে-তুল্য কিন্তু কীভাবে?

বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে বিজ্ঞানের বিকাশ মানব সভ্যতাকে এক উচ্চ শিখরে নিয়ে চলেছে। মানুষ শুধুমাত্র চাঁদের মাটিতে পা রেখেই ক্ষান্ত হয়নি, মহাকাশের অত্যাশ্চর্য রহস্য উন্মোচন করে বিশ্ব সমাজকে সে চমৎকৃত করেছে। এই প্রভূত উন্নতির বিপরীত চিত্র মানব সমাজের নৈতিক চরিত্রে। মানুষের চরিত্র দিন-দিন অবনমনরত। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের যে অবস্থা বিশ্ব সংসারে আজ যে পরিস্থিতি তা পার হয়ে আসা সত্য বা ত্রেতা যুগে ছিল না, এমনকী কলিযুগেরও কিছুদিন পূর্বে ছিল না। সুস্থ সমাজের সংজ্ঞাটাই পাল্টে গেছে। সুখের সারাংশ বলতেও আর কিছু নেই। দু-এক কথায় বলা যায় যে মানুষের জীবন আজ কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে। কেননা বর্তমান মানব জীবনে না আছে দৈবগুণ আর না আছে প্রকৃত শান্তির উপস্থিতি।

চলমান জটিল পরিস্থিতি দেখে বহু মানুষ আজ হতাশার

শিকার। ভাবছেন যে এত সাধু, সন্ত, মহান ব্যক্তিত্ব বিগত দু-আড়াই হাজার বছর ধরে তাঁদের সাধনালব্ধ ফল দ্বারা মনুষ্য সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে। তবুও দুনিয়ার নীচে নামা তো অব্যাহতই রয়েছে। এখন তো দুনিয়াকে শুধরোনোর কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না! কিছু মানুষের দুশ্চিন্তা প্রসূত প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীর তথা মানব সমাজের কী হাল হবে, এর সমাধান কীভাবে সম্ভব? সত্যিই কি এই সংসারের চূড়ান্ত রসাতলে যাওয়ার পরিবর্তে জেগে ওঠার সম্ভাবনা আছে?

কিছু মানুষের নিজস্ব কিছু অনুমান ও ভরসা মেশানো বক্তব্য — যদি ভগবান, ঈশ্বর পরমাত্মা বলে কোন মহাশক্তি থাকেন তাহলে তিনি কেন এই সৃষ্টিকে সংশোধন করছেন না? যদি পরমাত্মা অবতরণ করেই থাকেন তাহলে কেন তিনি এই সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হয়ে মানব মাত্রকে সদাচারের পাঠ পড়িয়ে দুঃখের অবসান ঘটিয়ে সুখের সংসার নির্মাণ করছেন না?

এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা ভাল যে বিশ্বে সম্পূর্ণ পবিত্রতা, সুখ ও শান্তি স্থাপন করার সামর্থ্য এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান কোন মানবের কাছে নেই, সে মানব যতই মহান হোন না কেন। এই মহান কর্ম একমাত্র জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, সর্বশক্তিমান, পতিত পাবন, পরমপিতা পরমাত্মাই করতে পারেন, তিনি কল্যাণকারী হওয়ার জন্য তাঁকে 'শিব' বলা হয়। পরমাত্মা শিব যখন এই মহান কাজ সম্পন্ন করার জন্য ধরিত্রীতে আসেন তখন কলিযুগের দুঃখের অন্ত হয়ে সত্যযুগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুখের কাল এসে যায়, মানুষের জীবন কড়ি-তুল্য থেকে হীরে-তুল্য হয়ে যায়। উপরন্তু সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগে দুঃখ অশান্তির নামমাত্র থাকে না। পরমপিতা পরমাত্মা এই মহান কর্তব্য সারা কল্পে (পাঁচ হাজার বছর অন্তর) একবারই করে থাকেন কলিযুগের শেষে যখন ধর্মের অতি গ্লানি হয়।

এই মুহূর্তে আমরা সানন্দে এই শুভ সংবাদ পরিবেশন

করছি, যা ভাবনারও অতীত সেই **পরমপ্রিয় নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব এই সৃষ্টিতে অবতরণ করে তাঁর মহান কর্তব্য শুরু করেছেন।** মনুষ্য মাত্রের সুখ-শান্তির প্রাপ্তির ইচ্ছা নিকট ভবিষ্যতেই পূর্ণ হতে চলেছে। একথা শুনে হয়তো অনেকে হতবাক হয়ে যাবেন বা আকাশ থেকে পড়ার উপক্রম মনে হবে কিন্তু শান্ত চিত্তে যদি বিচার করা যায় তাহলে অনুভব হবে, আজ যে সার্বিক পরিস্থিতি, দুনিয়ার অবনমন অতিমাত্রায় উপনীত হয়েছে ঠিক এই সময়টাই হল পরমাত্মার অবতরণ করার মহাশুভক্ষণ এবং সারা সংসারকে বদলে ফেলার যুগান্তকারী অধ্যায়। সবাই দেখছে বিশ্বের মহা বিনাশের জন্য এ্যাটম্ বোমা, হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হয়ে রয়েছে অনুসঙ্গ হিসাবে সারা বিশ্ব-সংসারে ভ্রষ্টাচার, পাপাচারের ভয়ংকর রূপ, জটিল সমস্যার বিশাল পাহাড়ই প্রমাণ করে একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত কারুর পক্ষে এই সমস্যাকুলের সমাধান সম্ভব নয়।

আশার বাণী, পরমপিতা পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সম্পূর্ণ পবিত্রতা, সুখ ও শান্তি ঈশ্বরীয় জন্ম সিদ্ধ অধিকার প্রদান করে চলেছেন।

বর্তমানে কল্যাণকারী, পতিত-পাবন পরমপিতা শিব মানব-জীবন কড়ি-তুল্য থেকে হীরে-তুল্য করার জন্য এবং এই সৃষ্টিকে পুনরায় সত্যযুগী দেব-দেবীর দুনিয়া তৈরির জন্য চার মুখ্য বিষয় সহজ রীতিতে পরিবেশন করেছেন উক্ত বিষয় নিজের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের শিক্ষা দিয়েছেন, এর মধ্যে মাত্র তিনটি অমূল্য অথচ সহজ যুক্তি এই লেখমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈশ্বরীয় জ্ঞান, একমাত্র ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নিশ্চয় বোধ

আজ মানুষের মনে সুখ-শান্তি না থাকার একমাত্র কারণ হল মানুষ নিজেকে নিজে ভুলে গেছে। বর্তমানে সে নিজেকে চেনে না, জানে না নিজের সৃষ্টিকর্তা পরমপিতা পরমাত্মাকে, অন্য মানুষের সাথে তার বাস্তবিক সম্পর্ককেও জানে না।

প্রসঙ্গতঃ ব্যক্তি দাবি করতেই পারে যে সে নিজেকে চেনে, তার পিতাকে জানে, অন্য মানুষের সাথে তার কী সম্পর্ক তা সে ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারে। হ্যাঁ এতে কোন সন্দেহ নেই কী প্রত্যেক মানুষ নিজের দেহকে, দেহের পিতাকে এবং দেহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত সবাইকে খুব ভালভাবে জানে। কিন্তু সব চাইতে বড় ভুল হল দেহ থেকে ভিন্ন অথচ দেহের মধ্যে অবস্থানকারী এক চৈতন্য শক্তি আছে। ঐ চৈতন্য শক্তিকেই ব্যক্তি জানে না। উক্ত চৈতন্যশক্তি হল এক 'আত্মা' যা পরমপিতা পরমাত্মার

অবিনাশী সন্তান। মানব শরীরে দুই ভ্রুকুটির মধ্যে এক উজ্জ্বল আলোক বিন্দুর ন্যায় আত্মা অবস্থান করে। ব্যক্তির স্মরণে থাকে না কী আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, এই সংসাররূপী খেলার প্রকৃত ইতিহাস কী, আমার জীবনে লক্ষ্য কী, আমার কর্ম কেমন হওয়া উচিত? এ সমস্ত বিষয় না জানার জন্য বিশ্ব সংসারের আজ এই করুণ দশা।

সুতরাং আজ ব্যক্তি এবং বিশ্ব সমাজের কল্যাণ তখনই সম্ভব যখন সে নিজেকে এবং নিজের পরমপ্রিয় পিতাকে জানবে, জানবে জীবনের লক্ষ্য, এছাড়া কর্মের গতি এবং তার গুহ্য রহস্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানকে। শুধু এই জানাই পর্যাপ্ত নয় উপরন্তু এই জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে সমঝদার হয়ে উঠতে হবে। যাকে বলা হয় জ্ঞানস্বরূপ হওয়া। জ্ঞান স্বরূপ হলে ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন আসবেই এবং প্রকৃত সুখের সে অনুভাবী হবে।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই ছোট শিশুকে তার

পিতা শেখায় — আমি তোমার বাবা, ইনি তোমার মা, অমুক তোমার ভাই, আমার নাম অমুক দেশের নাম .....। তো এসব কথা শিশুটি শুনে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে। এছাড়া পিতার আদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ শ্রদ্ধার সাথে সে পালন করে। এর ফল স্বরূপ পিতার সম্পত্তি জন্মসিদ্ধ অধিকার হিসাবে সেই সন্তান প্রাপ্ত করে থাকে। ঠিক এভাবেই পরমপিতা পরমাত্মা নিজের দিব্য নাম, ধাম, এছাড়া অন্যান্য আত্মাদের সাথে নিজের অবিনাশী সম্বন্ধের যে পরিচয় দেন তা শুধু বুদ্ধি দ্বারা নেওয়াই পর্যাপ্ত নয় বরং উক্ত জ্ঞানকে ব্যবহারিক রীতিতে প্রয়োগ করে মনে গভীর স্নেহের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে হবে যে স্বয়ং ভগবান আমার প্রকৃত পিতা। তবেই পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্রতা, সুখ ও শান্তি ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হবে।

ঈশ্বরীয় জ্ঞানে নিশ্চয়

ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার বিধি

হল কার্য-ব্যবহার করার সময় যেন ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানের উপর ধ্যান বা মনোযোগ থাকে ইহাকে নিশ্চয়বোধে থাকা বলে। নিশ্চয় বোধে স্থির থাকলে ব্যক্তির কর্মের উপর তার প্রভাব পড়ে। মানুষের নিশ্চয়বোধ যেমন কর্মও তেমন হয়ে থাকে। বাস্তবে দেখা যায় কোন ব্যক্তি যখন একটি পরিবারে দায়িত্বশীল পিতা হিসাবে নিজেকে নিশ্চিত করে তখন তার কাজের মধ্যে পিতৃসুলভ আচরণ ফুটে ওঠে। ঐ ব্যক্তিই যখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার জন্য যান তখন তার আচরণ একজন অধ্যাপকের ন্যায় হয়। আবার ঐ ব্যক্তিই যখন তার বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মশগুল হয়ে ওঠে তখন সে নিঃসংকোচে প্রাণখোলা আলাপচারিতা ও কথাবার্তায় মেতে ওঠে। ঠিক এভাবেই মানুষের 'নিশ্চয়ই' তার কর্মের প্রেরণা হয়ে ওঠে। সে যে রকম নিজেকে ভাববে সে সে রকম আচরণ করে থাকে।

এক্ষণে, পরমপিতা পরমাত্মা শিব ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান প্রদান করছেন তাতে নিশ্চয় করলেই আমাদের জীবনে

উন্নতি সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর জ্ঞানে আমাদের নিশ্চয় হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সফল হতে পারব না। এজন্য বলা হয় — 'নিশ্চয়াত্মা বিজয়ন্তী, সংশয়াত্মা বিনাশয়তি।'

নিশ্চয়রূপে ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে ধারণ

ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানকে দৈনন্দিন জীবনে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, কার্যে-ব্যবহারে এই নিশ্চয়ে স্থির হতে হবে — আমি এক আত্মা, আমি কল্যাণকারী, সুখদাতা, শান্তিদাতা, ত্রিলোকীনাথ, সর্বশক্তিমান, জ্যোতিস্বরূপ পরমপিতার জ্যোতিস্বরূপ সন্তান। আমি শুধুমাত্র শরীর নই। এই শরীর তো আমার 'রথ' যার উপর আমি 'রথী' আরোহন করে আছি। আমি নিজে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করা এক জ্যোতি-বিন্দু, অবিনাশী আত্মা। আমি প্রথমে যখন এই সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে এসেছিলাম তখন আমি পবিত্র, শান্তিময় ও নির্বিকার ছিলাম। আমি এই সৃষ্টিরূপী কর্মক্ষেত্রে নিজের অনাদি নিশ্চিত পার্ট সম্পন্ন করতে

এসেছি। কিন্তু এখন তো অভিনয় শেষ হওয়ার পথে আমাকে নিজঘর পরমধামে ফিরে যেতেই হবে। এজন্য এখানকার ধন-জনের সাথে জীবন নির্বাহ করলেও অনাসক্ত ও ত্যাগ ভাবনা রাখতে হবে কারণ এসবের সাথে আমার সম্পর্ক আর ক্ষণিকের জন্য। সর্বোপরি আমাকে তো এই শরীররূপী বস্ত্র পরিত্যাগ করে পুনরায় জ্যোতি-বিন্দুরূপে নিজঘর পরমধামে ফিরে যেতেই হবে।

আমি যেহেতু জ্যোতিস্বরূপ পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সন্তান, শিব পিতা 'কল্যাণকারী' আমাকেও তাই পিতার ন্যায় কল্যাণকারী মহান কর্তব্য করতে হবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ঈর্ষা, দ্বেষ, নিন্দা, হিংসাদি প্রসূত কোন কর্মই আমি করতে পারি না। কেননা আমি নিজের এবং অন্যের অকল্যাণ করতেই পারি না। কারণ অন্যের যে অকল্যাণ করে প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই অকল্যাণ হয়ে থাকে। অতএব এসব বাসনা ও বিকার সমূহ পরিত্যাগ করে নিজের লগন ঈশ্বরের সাথেই রাখব, হাড়

মাংসের শরীরের প্রতি আর হৃদয় দেওয়া নয়। মনবুদ্ধি ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করে মহানন্দে থাকব। দৈনন্দিন জীবনে কর্মতো করবই কিন্তু নির্বিকার হয়ে। যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শান্ত থাকব কারণ কর্মের পরিণাম তো জেনেছি। আমার জীবনকে শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা হীরে-তুল্য করতেই হবে। তাই বাকি জীবনের অমূল্য সময়কে কলিযুগীয় সংসারের যে কোন আকর্ষণে আর ব্যর্থ নষ্ট করব না।

আমি এখন নিজের প্রকৃত স্বরূপে স্থিত হয়ে আসন্ন মহাবিনাশের প্রাক্‌কালে সকলের কল্যাণ করব। বর্তমানে ঈশ্বরীয় জ্ঞান তথা সহজ রাজযোগ পরমপিতা পরমাত্মা শেখাচ্ছেন আমি এই শিক্ষাকে জীবনে ধারণ করে শুভ চিন্তক হয়ে অন্যকেও পবিত্রতা ও যোগমার্গে চলার জন্য সার্বিকভাবে সাহায্য করব। আমি স্বয়ং 'কমল পুষ্প সমান' পবিত্র জীবন ধারণ করে যোগযুক্ত হয়ে অন্যকেও যোগযুক্ত হওয়ার প্রেরণা দেব। বর্তমানে পরমপিতা পরমাত্মা সতোপ্রধান, সত্যযুগী দৈবগুণ সম্পন্ন দুনিয়া স্থাপনের

মহান কাজ করছেন। আমিও ভগবানের এই কাজে তন-মন-ধন দ্বারা সহযোগী হব।

প্রথম যুক্তি ?

আদর্শ দিনচর্যার প্রতি মনোযোগ

নিজের জীবনকে উন্নত অর্থাৎ হীরে-তুল্য করার জন্য মন্সা-বাচা-কর্মণা-র উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। নিজের দিনচর্যাকে সাবধানে চালানোর সাথে সর্বদা আত্ম-নিরীক্ষণ করে যেতে হবে। দিনচর্যার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে গাফিলতি করলে ব্যক্তির জীবনে দিন প্রতিদিন ক্রমাবনতি প্রকাশ পেতে থাকে সাথে সাথে সংস্কার খারাপ হয়ে যায়। নিম্নে একটি আদর্শ দিনচর্যার রূপ-রেখা প্রদত্ত হল।

১. অমৃতবেলায় ওঠা

বাড়ির ভিত সুদৃঢ় হলে বাড়ি মজবুত হয় তেমনি অমৃতবেলা হল সারা দিনচর্যার ভিত্তি। ঐসময় যার যেমন স্থিতি হয় সেই মত সারাদিন তার প্রভাব মানসিক অবস্থার উপর পড়ে। প্রত্যহ তিন বা চারটের সময় বিছানা ছাড়া অত্যন্ত সু-অভ্যাস রূপে পরিগণিত হয়। এই সময়ের বাতাবরণ খুব শান্ত থাকে। মন সারা দিনের সোচ-বিচার থেকে নিবৃত্ত থাকে এছাড়া রাতের ঘুমের পর সতেজ ও শান্ত থাকে। ঠিক এই রূপ একটি সময়ে ঈশ্বর স্মরণে লগ্ন হলে মন সহজেই মগ্ন হয়ে যায়। ফলস্বরূপ জীবনে সেরা প্রাপ্তি ঘটে। প্রাতেঃ তিনটের সময় উঠলে অবশ্যই দু-একঘন্টা নিদকে ত্যাগ করতে হয় তথাপি এই ত্যাগের জন্য হাজারো গুণ প্রাপ্তি হয়ে থাকে। যদি কেউ তিনটের সময় উঠতে না পারে তাহলে অবশ্যই চারটের সময় ওঠা জরুরী। কেননা এত দুর্লভ উপার্জনের জন্য কিছু সময়তো দেওয়া চাই। বাস্তবে দেখা যায় কিছুদিন অভ্যাস করলে অমৃতবেলায় ওঠা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

২. অমৃতবেলায় সর্বপ্রথম সংকল্প এবং স্মৃতি

একজন প্রকৃত শিক্ষার্থীর নিত্য-অভ্যাস এইরূপ হওয়া চাই যখনই তার ঘুম ভাঙ্গবে তখনই যেন পরমপিতা পরমাত্মার স্মৃতি প্রথমে তার মনে উদয় হয়। এরপর সারাদিনে যতই সে কাজ-কর্মে ডুবে যাক না কেন তবুও এই অভ্যাস তার স্বাভাবিক স্বভাবের অঙ্গ করে নিতে হবে। প্রাতেঃ অমৃতবেলায় জাগতেই প্রথমে অন্য কোন সংকল্প না এনে পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণই যেন আসে। এর সাথে এই বিচার আসবে — আমি এক আত্মা। এই ছোট্ট সংকল্প করতে অধিক সময় লাগে না কিন্তু এর প্রভাব সারা দিন দিনচর্যার উপর পড়ে থাকে। খাট থেকে ধড়পড় করে উঠে কোন কাজে লেগে পড়া উচিত নয়। ৫ - ৮ মিনিট পর্যন্ত এই স্মৃতিতে থাকা উচিত — আমি এক জ্যোতি-বিন্দু আত্মা, আমি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, প্রেমের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সন্তান। পরমপিতা শিব সবার কল্যাণকারী

সুখদাতা, শান্তিদাতা। আমিও ঈশ্বরের ন্যায় অন্যকে সুখ দানে ও কল্যাণ করতে নিমিত্ত হব। আমি আত্মা পরমধাম থেকে এই সৃষ্টি মঞ্চে এসেছিলাম এবং বাস্তবে আমি তো পরমধাম অথবা ব্রহ্মলোক নিবাসী যেখানে শুধু পবিত্রতা ও শান্তির বাতাবরণই সদা বিরাজ করে। প্রথমে এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আসার পর সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগে আমার জীবন পবিত্র ও দৈবগুণ সম্পন্ন ছিল। সদা সুখ-শান্তিতে ভরপুর ছিলাম। জীবন ছিল যথাক্রমে স্বর্ণতুল্য ও রৌপ্যতুল্য। প্রকৃতপক্ষে আমরা ছিলাম — 'সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে'। এখানে রাজ্য-ভাগ্য ছিল কোনরূপ দুঃখের চিহ্ন ছিল না। দ্বাপরযুগ ও কলিযুগে খুব ভক্তি করেছি এবং সামান্য সুখ ভোগ করেছি। বর্তমানে সঙ্গমযুগ চলছে। এই সঙ্গমযুগে ঈশ্বরীয় জ্ঞান দ্বারা অলৌকিক জন্ম নিয়েছি। ঈশ্বরীয় জ্ঞানের আধারে জেনেছি যে আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের অমর পুত্র অর্থাৎ আমি এক জ্যোতি-বিন্দুরূপ অশরীরী আত্মা। আমাকে শীঘ্রই নিজ ঘর পরমধামে ফিরে যেতে হবে।

আহা! কী সৌভাগ্য আমি পরমপিতা পরমাত্মার সাথে সম্বন্ধ জুড়ে নিয়েছি! নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন আমার প্রকৃত পিতা, শিক্ষক ও সদ্‌গুরু।

তিনি আমাকে এই মৃত্যুলোক থেকে প্রথমে শান্তিধাম পরে সত্যযুগে (বৈকুণ্ঠ/স্বর্গ) নিয়ে যাবেন। আমি এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী হয়েছি। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান তথা রাজযোগ দ্বারা নিজের জীবনকে কমল পুষ্পের ন্যায় পবিত্র করে হীরে-তুল্য তৈরি করছি।

এভাবে কিছু সময়ের জন্য জ্ঞানের মধুর রহস্যের কথা মনন করে দুশ্চিন্তা থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। স্নানাদি সেরে ঈশ্বরের স্মরণে বসতে হবে এরপর সময় মত নিকটবর্তী কোন রাজযোগ সেবাকেন্দ্রের জ্ঞান-কক্ষে (class) যাওয়া জরুরী। জ্ঞান-কক্ষে প্রত্যেকদিন মুরলী (ভগবানের মহাবাক্য) শোনানোর ব্যবস্থা আছে। এই মুরলী হল ভগবান প্রদত্ত দিব্য জ্ঞান যা আত্মার

ভোজন, বা আত্মার স্নান মনে করে প্রত্যেকদিন শ্রবণ করা উচিত। দৈবগুণ ধারণ করে জীবনকে হীরেতুল্য করার জন্য ভগবানের মুরলী হল একমাত্র দিকদর্শন।

৩. প্রতিদিন রাজযোগ কেন্দ্রে জ্ঞান যোগের অভ্যাস করা প্রয়োজন

ক্লাসে বসে প্রথমে নিজের মনকে নিরাকার জ্যোতি-স্বরূপ, বিন্দু-রূপ পরমধাম নিবাসী পরমাত্মা শিবের স্মরণে স্থির হয়ে শান্তি, শক্তি, প্রকাশ এবং পবিত্রতার অনুভবে স্থিত হতে হবে। এইরূপ একাগ্রচিত্তে স্মরণে অপার আনন্দে আত্মার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয় ফলে সারাদিন অলৌকিক খুশি এবং উৎসাহে অন্তর ভরপুর হয়ে থাকে। এরপর ক্লাসে যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান (মুরলী) শোনানো হয় তা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত। এর মধ্যে যে মুখ্য বিষয় (Main Point) থাকে তা নিজের নোটবুকে একজন বিদ্যার্থীর ন্যায় নোট করা উচিত। অন্য সময়ে ফুরসত মত ঐ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুনরায় দেখা ও মন্থন করা প্রয়োজন। পরমপিতা পরমাত্মা শিবের বাণী বা জ্ঞানে যে শিক্ষা অথবা সাবধানী মনুষ্য মাত্রের জন্য দেওয়া হয়েছে তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করে দেখতে হবে, সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে হবে যে আমার ভিতর অবগুণরূপী কাঁকড়কে বের করে জীবনে গুণরূপী রত্নকে ধারণ করতে হবে। আমাকে গুণবান হতে হবে।

ঈশ্বরীয় জ্ঞান-শ্রবণের সময়তেই শুধুমাত্র নিজেকে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বিদ্যার্থী ভাবলে হবে না। পরবর্তী সময়ে এই রেশ ধরে রাখতে হবে যে আমি পরমাত্মার এক সন্তান তথা আধ্যাত্মিক বিদ্যার এক বিদ্যার্থী, দেবপদ প্রাপ্ত করার এক পুরুষার্থী, এই ভাবনা এবং তার বাস্তবিক প্রয়োগে নিজের জীবন এক আদর্শ রূপ পাবে যা দেখে অন্য ব্যক্তিও আকৃষ্ট হয়ে এইরূপ সুখময় জীবন ধারণে প্রযত্ন করবে।

৪. ভোজন কেমন হওয়া উচিত এবং ভোজনের সময় স্থিতি কেমন থাকা উচিত

প্রতিদিন পরমপিতা পরমাত্মার মহাবাক্য শোনার পর ঘরে ফিরে কাজ-কর্ম তো করতেই হয়। প্রাতঃরাশ বা ভোজনাদি প্রস্তুত করা এবং তা গ্রহণ করা আনুষঙ্গিক সংসারের অন্যান্য কাজতো আছেই। ভোজন করার সময় ঈশ্বর স্মরণ এবং ঈশ্বরের গুণ মনন করা উচিত। ভোজন সাত্বিক ও শুদ্ধ হওয়া দরকার। ভোজনের সময় স্মৃতি থাকা চাই যে এসব পরমাত্মার ভান্ডারের প্রসাদ অথবা শিবভোগ গ্রহণ করছি।

এরূপ মানসিকতার জন্য মন সাত্বিক হবে এবং শরীর ঈশ্বরীয় সেবা তথা নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করতে মদত করবে। আহারের প্রতি আসক্তি রাখা ঠিক নয়, আহার গ্রহণের সময় অনাবশ্যক ব্যর্থ বার্তালাপ না করাই ভাল। আত্ম-স্বরূপে স্থিত হয়ে ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হয়ে সাক্ষীভাব রেখে ভোজন করা উচিত।

৫. কর্তব্য কর্মের সময় মনের স্থিতির উপর নজর রাখা

যে কোন কর্ম করার সময় সদা এই স্মৃতি থাকবে — আমিতো সর্বতোভাবে পরমপিতা পরমাত্মার। এসব ওঁনারই। আমিতো কেবল নিমিত্ত (Trustee)। ওঁনার যে কোনরূপ কাজে কোন প্রকার অহংকার করা যায় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকারের বশবর্তী হয়ে কাজকে কখনই কলুষিত করা বিধেয় নয়। উপরন্তু সবার সাথে শুদ্ধ প্রেম, শান্তি, পবিত্রতা এবং মৈত্রীভাবে চলা উচিত। প্রতি কর্মকে এই সৃষ্টিরূপী বিরাট নাটকের অভিনয় মনে করেই সম্পন্ন করা চাই। ধরা যাক কোন ব্যক্তি কোন নাটকে রাজার পার্ট করছেন কিন্তু তাঁর হুঁশ থাকে যে সে বাস্তবে রাজা নয়, অমুক স্থানে আমার ঘর, অমুক ব্যক্তির আমি ছেলে, কিছু সময়ের জন্য রাজার রূপে বেশভূষা ধারণ করে স্রেফ অভিনয় করছি। অনুরূপ ভাবে জ্ঞানবান আত্মা স্মরণে রাখেন — যদিও আমি এখন ব্যবসায়ী, অফিসর, ইঞ্জিনিয়ার অথবা চিকিৎসকের কর্তব্য করছি তথাপি এতো অল্পকালের জন্য অভিনয়

করছি। বাস্তবে আমিতো এসব ব্যতিরেকে এক 'আত্মা' জ্যোতি বিন্দু, আমিতো পরমধাম নিবাসী পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। আমার চারপাশে অবস্থানকারী আত্মীয়-পরিজন বা লেন-দেনকারী সকলেই আত্মা বাস্তবে জীবন্ত অভিনয়কারী। এইরূপ মনন চিন্তন করলে ব্যক্তির স্থিতি নির্মোহী, হাল্কা, প্রেমময় হয়ে যায়।

৬. প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট ও বৈরাগ্যভাব

বর্তমান পারিবারিক জীবনে কত রকম যে বিঘ্ন, কঠিন পরিস্থিতি আসে তার ইয়ত্বা নেই, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ তো নিত্যসঙ্গী। এরকম পরিস্থিতিতে জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্তব্য হল সাহসিকতার সাথে তা মোকাবিলা করা এর পরে যে পরিণাম হবে তা মনে করতে হবে অতীতের নিজকৃত কর্মের 'প্রারব্ধ' বা 'ভাবী' ফল। একে চলমান নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মেনে হর্ষ শোকের ঊর্দ্ধে উঠে বৈরাগ্যবৃত্তি ধারণ করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং নিজেকে একজন নিখাদ অভিনয়কারী ভাবতে হবে।

এসব তখনি সম্ভব হবে যখন কাজ কারবার করার সময়ও পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণে স্থিত থাকা যাবে। এইরূপ চিন্তা করা উচিত নয় যে কাজ কারবার সামলাতে হলে ঈশ্বরকে স্মরণ করা যায় না। বাস্তবে আমি তো প্রভুরই সন্তান তাঁর কাছেই তো আমাকে ফিরে যেতে হবে তাঁকেই আমার সমস্ত কর্মের হিসাব-কিতাব দাখিল করতে হবে সুতরাং কেনই বা প্রভুকে স্মরণ করব না। তাঁর স্মরণেই যদি কল্যাণ হয়ে থাকে তাহলে তাঁর বিস্মরণই বা কেন হবে! প্রিয় পিতার সাথেই তো আমার অত্যন্ত স্নেহ ও প্রেমের সম্পর্ক হওয়া উচিত কেননা তিনিই আমার জীবনকে কালের খাঁচা থেকে মুক্তি দেওয়ার মালিক, আমাকে সদা সুখ-শান্তি প্রদানকারী এবং মুক্তি ও জীবন্মুক্তিধামে নিয়ে যাওয়ার সদ্‌গুরু।

সচরাচর মানুষ ঈশ্বরকে তখনই ভোলে যখন সে ভাবে যত কাজকারবার করছে তা সবই নিজের ইচ্ছাতে করছে এবং এর ভালমন্দ দায়িত্ব তার নিজের। অথচ আমি নিমিত্ত, আমি ট্রাস্টি

আমার সমস্ত সম্পর্ক পরমপিতা পরমাত্মার সাথে বাকি সবার সাথে আমার বিগত জনমের হিসাব-কিতাব চুক্ত করছি এরূপ মনোভাব পোষণ করা উচিত।

ঠিক এই ধরণের আত্ম-সমীক্ষা করতে করতে ঈশ্বর-স্মরণ যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিপক্ক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। কঠিন, অসম্ভব, হওয়ার নয় এইরূপ নেতিবাচক চিন্তা একেবারে স্থান দেওয়া চলবে না। যদি বারবার নিজের স্বরূপ (আত্মা) এবং লক্ষ্য ভুল হতে থাকে এবং মন ঈশ্বরের স্মৃতিতে না বসে, সংসারের বিষয়ভোগে লিপ্ত হতে থাকে তাহলেও নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই উপরন্তু ভাবতে হবে — আমার অজ্ঞানের সংস্কার ভীষণ দৃঢ় সুতরাং আমাকে তো আরো তীব্র পুরুষার্থ (নিজের দুর্বলতাকে দূর করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা) করার প্রয়োজন। পুরুষার্থ পরিত্যাগ করলে তো সদ্‌গতি প্রাপ্ত হবে না। জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য পুরুষার্থতো প্রকৃতই হাতিয়ার। সুতরাং

পুরুষার্থবিহীন জীবনচর্যায় উন্নতি অসম্ভব। পক্ষান্তরে বিশ্ব সংসারের বিনাশ আসন্ন, পরিস্থিতি অতি সংকটাপন্ন তাই পুরুষার্থে উঠে পড়ে লাগতে হবে। স্মরণে থাকা দরকার — স্ব-স্থিতি দ্বারাই পরিস্থিতি পার করতে হবে।

পরিস্থিতির ভয়াল রূপ ও বিনাশকে নিকটে দেখে মানুষের ঈশ্বর স্মরণ এমনিতেই আসে। তাই যখন আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, মিসাইল এর মত ভয়ংকর অস্ত্র তৈরি সম্পন্ন, কোথাও ভূমিকম্প, সুনামীর মত সুবিশাল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কোথাও অন্ন সংকট, ধন সংকটাদির মতো সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখছি তখন কেন আমরা আমাদের অতিপ্রিয় পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করব না! অতএব অজুহাত দেখানো অনুচিত হবে যে — আমার পরিস্থিতি ঠিক নেই, আমার আশ-পাশের পরিবেশ, বাতাবরণ আমার অনুকূলে নয়, ঈশ্বরকে স্মরণ করার সময় সুযোগ নেই।

বর্তমানে যে সার্বিক পরিস্থিতি তা আমাদের সাধারণভাবেই ঈশ্বরমুখী হওয়া তো পরের কথা বরং ঈশ্বরবিমুখ করার পক্ষে যথেষ্টই আকর্ষণীয় বিষয় সম্ভারের পসরা সাজানো। বায়ুমন্ডল যতই প্রতিকূলে থাকুক নিজেকে প্রতিকূলতার কাছে সঁপে না দিয়ে দৃঢ়চেতা হয়ে প্রতিকূলকে অনুকূলে আনতে হবে। একটা জ্বলন্ত ধূপকাঠি যেমন একটা কামরাকে সুগন্ধে ভরিয়ে দেয় ঠিক তেমনি নিজের পুরুষার্থ, ঈশ্বরের স্মরণ দ্বারা যোগশক্তি, দিবগুণের প্রভা, আজ নয়তো কাল অবশ্যই আমার চারপাশের বায়ুমন্ডলকে মনোরম করে তুলবেই এই নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা উচিত।

৭. প্রতি ঘন্টায় কমপক্ষে পাঁচ-দশ মিনিট ঈশ্বরীয় স্মৃতিতে স্থিত হওয়া আবশ্যক

এতসব আত্ম-সমীক্ষা ও আত্মশাসনের পরও যদি অধিক সময় ঈশ্বরের স্মৃতিতে স্থিত হওয়া না যায় তাহলে প্রথমদিনে চেষ্টা করে প্রতি ঘন্টায় পাঁচ-দশ মিনিট পরমপিতা পরমাত্মা শিবকে

সপ্রেম স্মরণ করা চাই। এ অভ্যাসতো যে কেউ করতে পারে। রোগমুক্তির জন্য কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রতি দু'ঘন্টা অন্তর খাওয়ার পরামর্শ কোন চিকিৎসক যদি দেন তাহলে ব্যক্তি সহসা তা খেতে ভোলে না। প্রতি দুঘন্টা অন্তর নিয়ম করে সে ঔষধ সেবন করেই চলে। ঠিক একই বিধি এখানেও প্রযোজ্য।

সুতরাং যে ঈশ্বরীয় স্মরণে মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের জন্য নীরোগ, সদা স্বাস্থ্য, সদা সুখী অতুল ধন-ধান্যে সম্পন্ন হতে পারে তাহলে কেন সে ঈশ্বরীয় স্মরণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে। আমরা প্রায়ই দেখি যাদের পান, তামাক বা অন্য কোন নেশা করার অভ্যাস আছে তারা কিন্তু দু-একঘন্টা অন্তর তা গ্রহণ করে থাকে। এদের মেহনত করে স্মরণ করতে হয় না। স্বাভাবিক অভ্যাসের সংস্কার পড়ে যায়। তাহলে কেনই বা আমরা ঈশ্বরীয় স্মরণের ন্যায় শুদ্ধ সংস্কার রপ্ত না করি? এই ধরণের শুদ্ধ অভ্যাসে বা নেশায় না আছে কোন খরচ না আছে স্বাস্থ্যহানির ভয়।

সারাদিনে এমন অনেক কাজ আছে যেখানে বুদ্ধিকে পুরোপুরি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। ঠিক এইরকম কাজ করার সময় আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারি। চলতে-ফিরতে বা অন্য কোন কাজ করার সময় পরমাত্মাকে স্মরণ করার অভ্যাস আমরা চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আজকাল মানুষ এ বিষয়ে একেবারেই মনোযোগ দেয় না বরং ভীষণরকমই উদাসীন। ব্যর্থ চিন্তা করে কাল কাটায়।

পরমপিতা পরমাত্মা এ বিষয়ে বলেন — "হে বৎস, যদি আমাকে স্মরণ করার মত তোমার হাতে সময় না থাকে তবে তুমি যে সময়টা ব্যর্থ সংকল্পে নষ্ট করো সেই সময়টুকু আমাকে স্মরণ করে সফল করো। সারাদিনে আট ঘন্টা কাজ-কর্ম, আটঘন্টা আরাম, নিদ্রা, স্নানাদিতে খরচ করো বাকি আট ঘন্টা আমাকে স্মরণ করে নিজের কল্যাণ করো।"

৮. সায়ংকালের পুরুষার্থ

দিনান্তে সমস্ত কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে সামান্য বিশ্রামের

পর হাত মুখ ধুয়ে সামান্য আহারের পর কচ্ছপের মত কর্মেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে একান্তে অথবা পরিবারের সকলকে নিয়ে পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণে বসতে হবে। এভাবে অভ্যাস না করলে মন সারাদিন লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় এদিক সেদিক ঘুরে ফিরবে। যে ব্যক্তি শরীর ভান থেকে মুক্ত হয়ে বারবার নিজের মনকে বাহ্যিক দুনিয়া থেকে গুটিয়ে নিয়ে পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণে মগ্ন থাকার প্রয়াস করে সে ব্যক্তি যোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে।

সন্ধ্যাবেলায় যোগের এক বিশেষ প্রভাব থাকে। সান্ধ্যকালীন যোগে মন সতেজ ও বৃত্তি সাত্ত্বিক হয়ে যায়। সুতরাং সন্ধ্যাবেলায় ঈশ্বর স্মরণে বসার অভ্যাস রপ্ত করে নিতে হবে।

পারিবারিক কাজকর্ম বা খাওয়া-দাওয়ার মত আবশ্যিক কর্তব্য তো সম্পন্ন করতেই হবে। তাই বলে এই নয় যে সাংসারিক দায়িত্ব পালন করার অর্থ ব্যর্থ গল্পগুজব করা বা বৃথা সময় নষ্ট করা। তবে হ্যাঁ ব্যক্তির সুস্থ বিনোদনের প্রয়োজন আছে সেখানেও

সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে বিনোদনের ফলে যেন কু-অভ্যাস, খারাপ সংস্কার গড়ে না ওঠে।

এইরূপ সুস্থ সুশৃঙ্খল দিনযাপনের পর রাতে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান-চর্চা করে দশটা নাগাদ ঘুমোনোর জন্য তৈরি হয়ে যেতে হবে। ঘুমোনোর পূর্বে কিছু সময়ের জন্য অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণে বসা কর্তব্য। ঈশ্বরকে স্মরণ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম খুব ভাল বা সতোগুণী হয় এবং কোনরূপ কু-স্বপ্ন বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে না।

দিব্যগুণের ধারণা

জীবনকে হীরে-তুল্য করার অর্থই হল নিজের মধ্যে দিব্যগুণের সমাবেশ ঘটানো অপর দিকে আসুরিক অবগুণসমূহকে পরিত্যাগ করা। মনে রাখা দরকার মনুষ্যজীবন কড়ি-তুল্য ও দুঃখী হওয়ার মূল কারণই হল অশুভ আসুরিক অবগুণ রপ্ত করার জন্য। দিব্যগুণ ধারণ বিনা মনুষ্যাত্মা না পারে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে নির্বিঘ্নে যোগযুক্ত হতে না পারে যোগীজীবনের অলৌকিক অপার আনন্দে ভরপুর হতে। সুতরাং এই জীবনে সাচ্চা শান্তি পেতে এবং ভবিষ্যতে সদা-সুখী দৈবজীবন প্রাপ্ত করার জন্য অবশ্যই দিব্যগুণ ধারণ করার প্রতি আন্তরিক মনোযোগ দেওয়া উচিত।

১. পবিত্রতা ও জিতেন্দ্রিয়তা

দিব্যগুণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল পবিত্রতা। পবিত্র মানুষই

ঈশ্বরের ভালবাসা প্রাপ্ত করতে পারে। যে মানুষ পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি প্রেম নিবেদন করতে চায় তার নিজের তন-মন-ধন এর শুদ্ধতার প্রতি নজর দেওয়া কর্তব্য। বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে ধ্যান দেওয়া জরুরী। নিজের শরীর ও বস্ত্র সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। শৌচ কর্মের পর স্নানাদি সেরে নির্মল পোশাক পরিধান করতে হবে। মনের স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য পবিত্র ভোজন গ্রহণ করতে হবে। মনকে নিবৃত্ত রাখতে বিশেষ করে ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। জীবনকে কমল পুষ্প সমান করার মানে হল পবিত্র জীবন ধারণা করা।

নিজেকে শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী ও ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান জ্ঞান করলে এবং শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রী নারায়ণের বংশজ মানলে পবিত্রতার ধারণা হয়ে থাকে। এছাড়া পবিত্রতা ধারণের জন্য বিকল্প কোন উপায় নেই। পবিত্রতা ধারণ করতে হলে মনের বিক্ষেপতা এলেও সংশ্লিষ্ট কর্মেন্দ্রিয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াস চালিয়ে পূর্ণ

নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে আমি আমার সব কিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করেছি। আমার তন-মন-ধন সব ঈশ্বরের। সুতরাং ঈশ্বরকে প্রদত্ত কোন কিছুই আমি বিকর্মে ব্যবহার করতে পারি না। এই চোখ দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকারের দৃষ্টিতে কাউকে দেখতে পারি না। মুখ দ্বারা অপশব্দ, নিন্দা, বিকারী বোল বের করতে পারি না। কোন কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়ার মতো কোন কাজ করতে পারি না। আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেওয়ার পরও যদি কোন ব্যক্তি পাপ কর্ম করে থাকে তাহলে তাকে বহুগুণ দন্ড ভোগ করতে হয়।

২. অন্তর্মুখতা

প্রতিটি দৈবীগুণের নিজস্ব মহত্ব আছে। তার মধ্যে অন্তর্মুখতার অধিক মহত্ব। মানুষকে আত্মার স্বরূপের পরিচয় এজন্য দেওয়া যাতে সে অন্তর্মুখতার গুণ ধারণ দ্বারা অলৌকিক সুখ শান্তি প্রাপ্ত করে। অন্তর্মুখতা ধারণ করার অর্থ হল — দেহাভ্যন্তরে

যে আত্মা আছে তার স্বরূপকে তথা তার পিতা পরমাত্মার স্বরূপকে মনন করা, কানের দ্বারা আত্মার উন্নতির কথা শোনা, মুখ দ্বারা সেই কথা চর্চা করা, চোখ দ্বারা কোন মানুষকে দেখলেও মনের চোখ দ্বারা তাকে 'আত্মা' রূপেই দেখা। যে ব্যক্তি বাহ্যমুখী অর্থাৎ যার দৃষ্টি এবং বৃত্তি পরমাত্মার প্রতি না হয়ে অন্য কোন ব্যক্তি পদার্থের নাম রূপে মোহিত হয়ে যায় তার পূর্বকৃত বিকর্মের বিনাশ তো হয়ই না বরং আগামী দিনের জন্য বিকর্মের হিসাব বাড়তেই থাকে। উপরন্তু যে মনুষ্যাত্মা পরমপিতা পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত করে মনকে আত্ম স্বরূপে তথা পরমপিতা পরমাত্মার প্রেমযুক্ত স্মৃতিতে স্থিত করে, তার বুদ্ধি ও বৃত্তি বাহ্যিক পদার্থের প্রতি আকর্ষিত হয় না। এ ধরণের মানুষের উপর মায়া বা বিকারে প্রভাব পড়ে না। কোন ব্যক্তি এই ধরণের ব্যক্তিকে যদি মান-অপমান করে অথবা নিন্দা সূচক কোন মন্তব্য করে এমনকী লোভ বা ক্রোধের প্রভাব ফেলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে তবুও সে নিরপেক্ষ থাকবে। সব কিছু শুনেও শুনবে না। উঁচু স্থিতিতে স্থিত

হয়ে সে অন্তর্মুখতার গুণ দ্বারা দুষ্টের দুষ্টতা, অপকারীর অপকার সহজেই বর্জন করে দেবে। এইরূপ ব্যক্তিকে অশান্তি ও দুঃখ ছুঁতে পারে না। অন্তর্মুখী মানুষ না খারাপ শোনো, না খারাপ বলে, না খারাপ চিন্তা করে, না খারাপ কর্ম করে, না এসবের প্রতি মনোনিবেশ করে। এজন্য তার মনরূপী রাজহাঁস শান্তিরূপী সরোবরে সদা শীতলতার মুক্তা চয়ন করে বেড়ায়। সুতরাং হীরে-তুল্য অমূল্য গুণ অন্তর্মুখতা ধারণ করে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে এতে সহনশীলতাদি গুণ অর্জিত হয় এবং জীবন দিব্য হয়ে যায়।

৩. সহনশীলতা

জ্ঞান-মার্গে চলতে থাকা পথিকের জীবনপথে অনেক প্রকারের বিপরীত পরিস্থিতি সামনে এসে হাজির হয়। অন্য ব্যক্তির নিন্দা বা কটু আলোচনা শুনতে হয়। ওসব সহন করার মধ্যে নিজের কল্যাণ লুকিয়ে থাকে। এসব পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আসে,

নিজেকে নিজে দেখা যায় যে আমার মধ্যে ক্রোধ বা আবেশের সংস্কারতো নেই? অথবা সামান্য কঠিন পরিস্থিতিতে বেসামাল অবস্থা হয়ে যায় এমন কাঁচা লগন পরমপিতা পরমাত্মার সাথে নয় তো? অতএব সর্ব প্রকারের প্রতিকূল পরিস্থিতি পরমাত্মার স্নেহে সহ্য করার শক্তি অর্জন করে নিতে হবে। এভাবে ভাবতে হবে — লৌকিক সম্বন্ধে কোন প্রিয়জনের মঙ্গলের জন্য বা কোন বড় সফলতা পাওয়ার জন্য যেমন অনেক কিছু প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয় ঠিক সেভাবে ঈশ্বরের স্নেহ প্রাপ্তির জন্য বা নিজের জীবনকে উঁচু করতে অথবা ভবিষ্যতে অতুল প্রাপ্তির জন্য অল্পবিস্তর তো সহন করতেই হবে। আমাদের চলার পথে তন-মন-ধনের উপর যে পরীক্ষা বা বিঘ্ন আসবে তা ভাবতে হবে যে, এসব তো আমাদের পূর্বকৃত কর্মের প্রারব্ধ রূপ যার মুখোমুখি হয়ে সদাকালের জন্য হিসাব-কিতাব মিটিয়ে নিই। অন্যের অবগুণ বা অপকর্ম দেখে ক্রোধান্বিত বা উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। বরং এই লক্ষ্য রাখা উচিত আমার জীবন তো হীরে-তুল্য করতে হবে সুতরাং গুণগ্রাহক হতে হবে। অন্যের অবগুণ ধারণ করা

নয় উপরন্তু নিজের অবগুণ বর্জন করতে হবে।

৪. গুণগ্রাহকতা

একটি সাধারণ বিষয় মানতেই হবে যে — প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে অবগুণের অতিরিক্ত কোন না কোন ভাল গুণ আছেই। অতএব আমাকে ঐ ব্যক্তির অবগুণ না দেখে তার ভালগুণ ধারণ করতে হবে। আমি কোন ব্যক্তির অবগুণের গ্রাহক হব না বরং গুণরূপী রত্নের ধারক হব। মানুষের এই হুঁশ থাকে না যে যেকোন মুহূর্তে আমাদের জীবন প্রদীপ নিভে যেতে পারে সুতরাং অন্যের দোষ চিন্তন করে নিজের দুর্গতি না হয়ে যায়! সৃষ্টির নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটির জন্য তাকেই দন্ড ভোগ করতে হয়। আমি কেন তার দোষ-ত্রুটির চিন্তন করে দোষী হয়ে দুঃখের ভাগীদার হব? বিপরীতক্রমে অন্যের অবগুণ না দেখে স্বয়ং প্রফুল্ল এবং হর্ষিত থাকব। তাকে কল্যাণের দৃষ্টিতে দেখব তার শুভ-চিন্তক হয়ে প্রয়াস করব তার অবগুণ থেকে তাকে মুক্তি

দিতে। কিন্তু কখনই তার অবগুণ নিজের মধ্যে ধারণ করে নিজেকে দুঃখী করে তুলব না। যদি কেউ আমাকে অন্যের দোষ দেখিয়ে দেয় সাথে সাথে আমার উচিত মনকে একাগ্র করে দেখা - আমার মধ্যে ঐ ধরণের দোষ নেই তো? আমি তো পরমপিতা পরমাত্মার গুণগ্রাহক। অবগুণসমূহ তো বের করে দিতে চাইছি তবে কেন অন্যের অবগুণ দর্শন করব? প্রভুর কাছে আমি নিজেকে তো অর্পণ করে দিয়েছি তাই অবগুণ ধারণ করার মত পাপ আর করতে পারি না।

৫. অর্পণময়তা

নিজের জীবন থেকে বিষয় বিকার এবং আসুরীগুণ পরিত্যাগ করার মুখ্য যুক্তি হল পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি অর্পণময়তা। এখন আমার অবস্থান যেমনই হোক না কেন এই মুহূর্ত থেকে ভাবব — আমার তো কিছুই নয় আমার সবকিছু পরমপিতা পরমাত্মাকে অর্পণ করছি। আমাকে নিশ্চিত করে নিতে

হবে — আমার তন-মন-ধন সব পরমপিতা পরমাত্মারই দান। সুতরাং এখন থেকে তাঁর কথিত আজ্ঞার অনুকূলে চলব।

যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে হীরে-তুল্য করে গড়ে তুলতে চায় তার উচিত নিজের কড়ি-তুল্য জীবন পরমাত্মাকে অর্পণ করে নিজের যা কিছু সব ঈশ্বরের আমানত ভেবে পবিত্র আচরণ অর্থাৎ নির্বিকার রীতিতে কর্তব্য পালন তথা ঈশ্বরের সেবায় লেগে পড়া। এই বিধি দ্বারা মানুষ তার নিজের তন-মন-ধন থেকে মমতা মিটিয়ে ফেলতে পারে তদুপরি নিজের সম্বন্ধ সম্পর্কের যে মোহজাল আছে তা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল তার বুদ্ধি স্বতঃই নিজের তন-মন-ধন মিত্র সম্বন্ধীর প্রতি রাখা। এজন্য ঈশ্বর-স্মরণের ন্যায় উঁচু স্থিতি সে প্রাপ্ত করতে পারে না। সুতরাং ঘর, আত্মীয়-পরিজন, ধনের প্রতি মমত্ব দূর করার জন্য জঙ্গলে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। বলা বাহুল্য এসব কিছু পরমপিতা পরমাত্মাকে অর্পণ করে নিজেকে নিমিত্ত

(Trustee) ভাবা হল সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি। এই বিধিতে মানুষের জীবন থেকে বিকার ও আসুরীপনা দূর হয়ে তার স্থানে পবিত্রতা ও মধুরতা ভরপুর হয়ে যায়।

৬. মধুরতা

ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সাহায্যে জীবনে মধুরতা আনয়ন স্বাভাবিক; কারণ এই জ্ঞানই হল বিকারের বিষ দূর করা এবং আসুরিক অবগুণ হরণ করার মহৌষধ। মধুরতা তখনি আসবে যখন মানুষ এই সৃষ্টিকে এক বিরাট নাটক মনে করে সাক্ষী হয়ে দেখবে। যে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়ে আসছে, হচ্ছে এবং আগামীতে চলবে। নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী নিজের পার্ট সে করে চলেছে। এই রহস্য মানুষের সামনে উন্মোচিত হলে অন্যের সাথে সে দুর্ব্যবহার করতে পারে না এমনকী পীড়াদায়ক শব্দও প্রয়োগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। নিজের কল্যাণের জন্যই সে মধুর বোল, দিব্যগুণযুক্ত মঙ্গলময় বাক্য উচ্চারণ এবং ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন

করতে করতে সে গদগদ হয়ে আনন্দ অনুভব করে এবং আনন্দ দান করে।

জ্ঞানস্বরূপ ব্যক্তি কখনো কাউকে কটুবচন রূপী পাথর মারে না উপরন্তু জ্ঞানের মধুরবোল রূপী পুষ্পের দ্বারা অন্যের ঝুলি ভরে দেয়। মানুষের বদ্‌স্বভাব হওয়ার পিছনে বিকারই দায়ী। তাই বিকারকে নিজের শত্রু, অপকারী, অকল্যাণকারী এবং হানিকারক জ্ঞান করা উচিত। যখন মানুষ জ্ঞানের আধারে এই রহস্য জানতে পারে যে আত্মার শত্রু তার নিজের পূর্বকৃত অপকর্ম অথবা বিকার, অন্যের দ্বারা প্রারব্ধ রূপে তার সামনে হাজির হয় তখন ঐ ব্যক্তিকে সে শত্রু মনে করে না বরং নিজের কর্মকে শ্রেষ্ঠ করার আন্তরিক হয়। নিজের মধ্যে প্রেম, সদ্‌ভাবনা এবং সদ্‌গুণ ধারণ করে মায়া বা বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করে। এইরূপ ব্যক্তি মধুরতা দ্বারা অন্যকে আকৃষ্ট করে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি জাগ্রত করার প্রয়াস করে থাকে।

৭. হর্ষিতমুখতা

ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত করার পর ব্যক্তির মধ্যে এই নিশ্চয় এসে যায় — "আমি ত্রিলোকীনাথ, সর্বশক্তিমান, পতিত-পাবন, শান্তি ও আনন্দের সাগর, স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্য বিধাতা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সন্তান" আমার মুখে কখনই শোক বা চিন্তার কোন চিহ্ন থাকা উচিত নয়। সর্বসমর্থ পরমপিতা, পরমশিক্ষক এবং পরম সদ্‌গুরু পরমাত্মা যেহেতু আমাকে শান্তিধাম এবং বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন সেহেতু আমার আর খুশির অন্ত থাকা উচিত নয়। আমিতো পবিত্র আর যোগ যুক্ত হয়ে যাচ্ছি এবং নিজের ভাগ্যকে অনেক উঁচুতে নিয়ে চলেছি সুতরাং চিন্তা বা শোকের নাম গন্ধই থাকবে না। যদি আমার সামনে কোন দুর্ঘটনা, রোগ বা কোনরূপ হানিকারক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে জ্ঞানের আধারে বিচার করতে হবে যে আমার কর্মভোগ শেষ করার জন্য এরা এসেছে। যোগবল দ্বারা কর্মভোগ সমাপ্ত করার

বিধি আমার জানা হয়ে গেছে। আমার মাথায় যে ঋণের বোঝা ছিল তা নেমে যাচ্ছে। সুতরাং বোঝা হাল্কা হওয়ার খুশিতে থাকতে হবে। চিন্তা শুধু রাখতে হবে কীভাবে নিজেকে এবং অন্যকে পবিত্র এবং যোগ-যুক্ত করা যায়।

যে ব্যক্তির বুদ্ধিতে সদা এই ভাবনার তাত লেগে থাকবে তার অন্য কোন কথা ভাববার সময়ই থাকবে না। এইরূপ ব্যক্তি "ঈশ্বরকে একবল এক ভরসা" নিশ্চিত করে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয়ে পুরুষার্থে তৎপর থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলতে থাকে।

৮. নির্ভয়তা

যে ব্যক্তি সাচ্চা দিলে পরমপিতা পরমাত্মার সাহারা নিয়ে থাকে এবং তার নিজের তন-মন-ধন ঈশ্বরকে অর্পণ করে দেয় তার আর কীসের ভয়? যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি শুভভাবনা রেখে তার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে তার ভয় কীভাবে হতে পারে?

ভয় তারই থাকে যে স্বয়ংকে 'আত্মা' নিশ্চয় না করে 'দেহ' জ্ঞান করে অথবা কোন বস্তুর প্রতি গভীর মমতা রাখে।

সর্বশক্তিমান পরমাত্মার শরণ নেওয়া ব্যক্তি অচল, অটল নির্ভয়চিত্ত হয়ে জীবন ধারণ করে এবং এভাবে জ্ঞানের মধুর রহস্য সদা মনন চিন্তন করে — যা কিছু হবার তা হবেই, অতীতে যে কর্ম আমি করেছি তার ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে, যে কোন পরিণামের জন্য আমাকে নির্ভয়চিত্তে নিজের কর্তব্য সঠিক রীতিতে নিষ্পন্ন করতে হবে শেষ রক্ষক পরমপিতা পরমাত্মার সহায়তার উপর নির্ভর করে সাক্ষী হয়ে কর্ম করে যেতে হবে।

৯. সাক্ষীদ্রষ্টা

সাক্ষী হয়ে জীবন অতিবাহিত করলে জীবন মোহবন্ধনহীন ও প্রিয় অনুভব হয়। এ ধরণের ব্যক্তির উপর হর্ষ-শোক, মান-অপমানের মত কোন ঘটনা রেখাপাত করে না। সাক্ষীদ্রষ্টা ব্যক্তি জীবন থেকে যে আনন্দরস আস্বাদন করে তা কোন কোটীপতির

পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।

কোন মানুষের সাক্ষীপন স্থিতি তখনি সম্ভব যখন সে এই সংসারকে এক বিরাট চলমান নাটক মনে করে, যা ধীরে ধীরে অভিনীত হচ্ছে। আর এই নাটকে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপধারী অভিনেতা-অভিনেত্রী জীবন্ত এই নাটকে নিজ নিজ নির্ধারিত পার্ট যথার্থ রীতিতে অভিনয় করে চলেছে। আমি তা সাক্ষী হয়ে দেখছি। আমি দোদুল্যমান নই আমি নিশ্চল। নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনাকে চলন্ত নাটকের অংশ মনে করে কোন ব্যক্তি স্বয়ংকে (আত্মা) সাক্ষী মানলে তবে সদা আনন্দে বা নারায়ণী নেশায় নিজেকে রাখতে পারবে। সাক্ষী অবস্থায় মানুষের মনে এরূপ বিচার আসে — এই পার্ট (অভিনয়) তো আমি অনেক বার দেখেছি বা করেছি। যে যেরকম পুরুষার্থ করছে সেই অনুযায়ী ফিল্ম তৈরি হচ্ছে যা আগামীদিনে বাস্তবে দেখা যাবে।

সাক্ষীদ্রষ্টা নিরপেক্ষ হয়ে নিজের এবং অন্যের অভিনয়

দেখে, আত্মীয়-পরিজনের সাথে দিন যাপন করলেও তার মনে সদা থাকে — এরাতো এই বিশাল নাটকের এক একজন কুশীলব। এরা সবাই আত্মা। শরীররূপী বেশ-ভূষা ধারণ করে ক্ষণিকের জন্য আমার সাথে অভিনয় করছে। আমার সাথে এদের অভিনয় যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন বিচ্ছেদের পালা আসবে। আর সেই দিন এলো বলে যেদিন এ্যাটম্ বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই বিশাল নাটকের যবনিকা পড়বে।

সুতরাং অনুভব করা উচিত, যে অভিনয় চলছে তা অন্তিম দৃশ্যের অভিনয়। এই বিশাল ক্রীড়াঙ্গনের খেলা অচিরে সমাপ্ত হয়ে যাবে। এরূপ বিচার বোধের দ্বারা সংসারের বিষয় পদার্থের উপর থেকে মন উবে যাবে, মনে হবে যেন তার পা ধরণীতেই নেই। জীবন-রূপী জাহাজের নোঙর এই সংসার-তট থেকে তুলে নিয়ে ওপারে এগিয়ে চলেছে। এইরূপ ব্যক্তি নম্র স্বভাবের দ্বারা জীবনকে উচ্চাসনে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় লেগে থাকে।

১০. নম্রতা

জ্ঞানবান ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর সুতীক্ষ্ণ নজর দেওয়ার কারণে জানতে পারে যে, তার ভিতরে বহু ত্রুটি আছে যা বের করে দৈবগুণ ধারণ করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করতে হবে।

এইরূপ ব্যক্তি বুঝতে পারে যে এখনো সে সম্পূর্ণ হয়নি তাই অন্যের সাথে ব্যবহারে নম্রতা রাখে। এধরণের সংবেদনশীল ব্যক্তি অন্য আত্মার সংস্কার বশতঃ খারাপ ব্যবহারে দোষারোপ করে না। অপরের দুর্বলতা দেখে নিজে অহংকার করে না বা ঘৃণা প্রদর্শন করে না। বরং তাকে বদ্ সংস্কার থেকে মুক্ত করে এগিয়ে দেওয়ার জন্য শুভ ভাবনা ও স্নেহের সাহারা দিয়ে থাকে। নম্রতা ধারণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে যদি কেউ তার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয় তাহলে সে অসন্তুষ্ট হয় না উপরন্তু নিজেকে সংশোধন করার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ত্রুটি নির্দেশক ব্যক্তিকে তার শুভচিন্তক

জ্ঞান করে।

জ্ঞানবান ব্যক্তি কখনই অভিমান রাখে না যতই তাকে অন্যেরা অপমান করুক বা গুরুত্ব না দিক। অন্যের কূ-ব্যবহারবে সে নিজের মধ্যে স্থান দেয় না, জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কৃতকর্মের ভোগ তাকেই ভুগতে হবে। সুতরাং অহেতুক ঘৃণা, অহংকার ও কুটিলতা প্রকাশ না করে ব্যবহারে সে সরলতাই দেখিয়ে থাকে।

১১. সরলতা

মানুষের মনের সরলতা ও স্বচ্ছতার উপরই সাচ্চা সাহেব পরমাত্মা রাজী থাকেন। মানুষ যেরূপ স্বচ্ছ, সরল, নিষ্কপট ও স্পষ্ট হয় সেরূপ পরমপিতা পরমাত্মার অনুভবও তার স্পষ্ট হয়ে থাকে। মানব মনের সরলতাই পরমাত্মাকেও তার দিকে আকৃষ্ট করে। এজন্য 'সরলতা' জ্ঞানবান ব্যক্তিরই গুণ গণ্য হয়। সরলতা

ব্যতীত জীবনে জ্ঞান ধারণ সম্ভব নয় উপরন্তু সাচ্চা আত্মিক সুখের অনুভূতি হওয়াও অসম্ভব।

১২. দৃঢ়তা, আত্ম-বিশ্বাস এবং তীব্র পুরুষার্থ

'আমি তো পুরুষার্থী এজন্য কিছু ভুল হয়েই থাকে' এ ধরণের সান্ত্বনা পাওয়া অনুচিত। বরং ভাবা উচিত পুরুষার্থীর অর্থ হল বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করা, কর্মেন্দ্রিয়দের নিয়ন্ত্রণে রেখে সম্পূর্ণ ভাবে যোগ-যুক্ত থাকার উপর যত্নশীল থাকা। যদি একই প্রকার ভুল বারবার হতে থাকে তাহলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে পরবর্তীকালে এরকম ভুল আর দ্বিতীয়বার যেন না হয়। শুধুমাত্র দৃঢ় সংকল্প করলেই হবে না আত্মবিশ্বাসের সাথে তীব্র পুরুষার্থও করে যেতে হবে।

উপরোক্ত কিছু দিব্যগুণের কথা উল্লেখ করা হল। নিজের জীবন হীরে-তুল্য করে গড়ে তুলতে এসব দিব্যগুণ ধারণ করা একান্ত কর্তব্য। এই মহামূল্য গুণ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু গুণ যেমন

মৃদুতা, গম্ভীরতা, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য এবং অন্যের প্রতি শুভপ্রেম তথা শুভভাবনার মত সদ্‌গুণ জীবনে ধারণা করা আবশ্যক। ধারণ করার জন্য যে পুরুষার্থ প্রয়োজন তা কিন্তু কঠিন নয়।

তৃতীয় যুক্তি

নিয়ম পালন

নিজের জীবনকে হীরে-তুল্য করে গড়তে, শ্রেষ্ঠ কর্ম আয়ত্ত করতে অথবা এই জীবনেই 'যোগের' আনন্দে ভরপুর হতে অবশেষে মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত করার জন্য কিছু নিয়ম অবশ্যই পালন করার বিধি মান্য করতে হবে। স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে আমাদের জন্য কিছু নিয়ম পালনের আজ্ঞা দিয়েছেন। নিয়ম পালন ব্যতিরেকে 'জ্ঞান এবং যোগ' মার্গে আমরা উন্নতি করতে পারব না। প্রাপ্তি হবে না প্রকৃত শান্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির।

১. ব্রহ্মচর্য পালন

নিয়ম সমূহের প্রথম নিয়ম হল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য পালন বিনা ঈশ্বরীয় স্মৃতিতে স্থিত হওয়া অসম্ভব ক্রোধাদি সহ অন্য বিকারও শান্ত করা অকল্পনীয়। ব্রহ্মচর্য পালনে মানুষের বুদ্ধি স্বচ্ছ হয় আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার হয় ফল স্বরূপ অন্য বিকারের উপর জয়ী হওয়া যায় অথবা মোকাবিলা করার হিম্মত এসে যায়। অতএব 'কাম বাসনা' কে মহাশত্রু মনে করে ব্রহ্মচর্যকে নিজের মিত্র ভেবে নিজের ভিতর থেকে 'কাম' বিকারকে বহিষ্কার করে মন্সা-বাচা-কর্মণা-র ব্রহ্মচর্য পূর্ণরূপে পালন করতে হবে। পবিত্র দুনিয়াকে পতিত বা অপবিত্র করার মূলে অথবা দেব-পদ থেকে টেনে হিঁচড়ে নীচে নামানোর জন্য এই কাম বিকারই দায়ী। এটা আমাদের খুব ভালভাবে বুঝে নেওয়া জরুরী কাম বিকারের উপহার হল - স্বাস্থ্যহীনতা, স্বল্প আয়ু এবং মানসিক দুর্বলতা।

পরমপিতা পরমাত্মা শিব আমাদের সকলের কল্যাণের

উদ্দেশ্যে স্নেহের আহ্বানে বলছেন — "হে বৎস, জন্ম-জন্মান্তর তো তুমি তোমার লৌকিক মাতা-পিতার নিকট থেকে বিকার নকল করে এসেছো অথচ এই বিকারের জন্যই তুমি সত্যযুগীয় সুখময় জীবন এবং দৈবী রাজ্য - ভাগ্য হারিয়েছো। এই বিকারের জন্যই তুমি মহাদুঃখী হয়েছো। অতএব তুমি এই জনমেই তোমার পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে জন্ম সিদ্ধ অধিকার 'পবিত্রতা' আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও। হে বৎস, তুমি জন্ম-জন্মান্তর আমার কাছে প্রার্থনা করে এসেছো — হে পতিত পাবন পরমাত্মা আমাকে তুমি এই বিষয় বিকার থেকে মুক্ত করো। অথচ আশ্চর্য বিষয় আমি যখন তোমাকে এর থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পরমধাম থেকে এসেছি তখন তুমি এসব ছাড়তেই চাইছ না! আমিতো তোমাকে মহাখারাপ বিষয়গুলো ছাড়তে বলছি অথচ তুমি সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে বসে আছ। তুমি কি কামরূপী বিষকে সাহারা করে ভবসাগর পার হয়ে যাবার আশা করে বসে আছ?"

এখন সংকটকালীন পরিস্থিতি, তাই পবিত্র হও

কল্যাণকারী পরমপিতা শিব বলছেন — "হে বৎস, বর্তমান পরিস্থিতি সংকটকালীন (Emergency) পরিস্থিতি। এই কলিযুগীয় মহাবিনাশ নিকটে দাঁড়িয়ে। অন্তিম জীবনের স্বল্প সময় আর বাকি আছে। এখন আমার আজ্ঞা (Ordinance) হল পবিত্র হও, ব্রহ্মচর্য পালন করো এবং কামরূপী শত্রুকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করতে দিও না। ভাবো — আমাকে এখন শ্রীলক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করতে হবে অথবা সারা ভারতকে বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে পরিণত করে দেবালয় বানাতে হবে। হে বৎস, এই মহাবিনাশের মাধ্যমে বিকার তো ছুটে যাবেই কিন্তু স্বেচ্ছায় যদি তুমি যোগের লগন দ্বারা ব্রহ্মচর্য পালন করতো আসন্ন দৈবী স্বরাজ্যে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পবিত্র এবং দৈবী রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হবে। হে বৎস, কেন তুমি স্বল্প সময়ের জন্য মহাবিকারকে ছাড়তে পারবে না? কেন, তুমি আমার জন্য এই সামান্য বলিদান দিতে পারবে না? আমার প্রতি

তোমার কি যৎসামান্যও প্রীত নেই যে সামান্য সময়ের জন্য এই জঘন্য বদ্‌সংস্কার ছাড়তে পারবে না?"

ভগবান শিব বলেন — "হে বৎস আজ যে গৃহস্থ জীবন চলছে তাকে 'গৃহস্থ আশ্রম' বলা যায় না কারণ 'আশ্রম' পবিত্র স্থানকে বলা হয়। কামকাটারি প্রয়োগের জন্য কলিযুগের ঘরে ঘরে হিংসা আর ভ্রষ্টাচার স্থান করে নিয়েছে। হে বৎস, প্রকৃত অর্থে গৃহস্থাশ্রম তো শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণের গৃহস্থ জীবনকে বলা হয় যেখানে কাম বিকারের নামগন্ধ নেই। যোগবল দ্বারা সন্তানাদির জন্ম হয়। অতএব পূর্বজকে অনুসরণ করে পবিত্র হওয়া জরুরী। ভগবানের সন্তান হয়ে শয়তানের ন্যায় কর্ম করা অনুচিত। বর্তমানে তাই কামরূপী বিষ পান করা এবং পান করানো থেকে বিরত হয়ে জ্ঞানামৃত পান করাই শ্রেয়।"

২. অন্নের সাত্বিকতা ও পবিত্রতা

অন্নের প্রকৃতি মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। তমোগুণী ভোজনে মানুষ সত্ত্বরই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এছাড়া তার বৃত্তি

অপবিত্রতায় ঘিরে থাকে তথা আলস্য নিদ্রা আদি প্রধান হয়। ঠিক এইভাবে রজোগুণী অন্ন গ্রহণে মানুষের মন দারুণ চঞ্চল হয় দৃষ্টি বৃত্তি অপবিত্র হয়ে থাকে। সাধারণ কারণেই মানুষ উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উচিত-অনুচিত অথবা ধর্ম-অধর্ম-র পার্থক্য সঠিক রীতিতে করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তির আহার সতোগুণী নয় সে না পারে কাম-ক্রোধাদি বিকারের উপর সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করতে না পারে 'যোগে' উচ্চ স্থিতিতে আসীন হতে।

যদি ঈশ্বরীয় স্মৃতির আনন্দ লাভ করার ইচ্ছা হয় বা ভোগী থেকে যোগী এবং কর্মেন্দ্রিয় তথা বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হয় তাহলে আহারের প্রতি অবশ্য মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের আহার পবিত্র ধন দ্বারা আহৃত হওয়া উচিত এছাড়া আহারের পদ (item) এমন হবে যা দেবতার মন্দিরে দেবতার সামনে ভোগ দেওয়ার সমতুল্য হয়।

একটি বিশেষ বিষয়ে ধ্যান রাখা জরুরী। কোন কামী ক্রোধী

মানুষের হাতে প্রস্তুত করা ভোজন গ্রহণ করা উচিত নয়। একাধারে যেমন অন্নের প্রভাব মনের উপর পড়ে তেমনি মনের প্রভাবও অন্নের উপর পড়ে থাকে। তাই বিকারী মানুষের হাতে তৈরি ভোজন দূষিত হয়ে যায়। ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং পরমপিতা পরমাত্মার স্মৃতিতে স্থিত থাকেন এইরূপ ব্যক্তির হাতে প্রস্তুত ভোজন আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এতে আধ্যাত্মিক পুরুষার্থে সহায়ক হয়। পুনশ্চঃ ভোজন করার সময় আমাদের আশু পালনীয় বিষয় হল পরমাত্মার স্নেহ-যুক্ত স্থিতিতে স্থিত থাকা এর ফলে ভোজনের প্রতি আসক্তি দূর হবে এবং ভোজন পবিত্র হয়ে যাবে।

৩. জ্ঞানবান এবং যোগ-যুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ

সঙ্গের রং বা প্রভাব মানুষকে খুব সহজে প্রভাবিত করে। তাই বিকারী মানুষের সঙ্গ না করে ঈশ্বরপ্রেমী, যোগাভ্যাসী তথা নিশ্চয়বুদ্ধি মানুষের সঙ্গ করা লাভদায়ী এতে দিনের পর দিন আত্মিক উন্নতির ক্রমবিকাশ ঘটে। দৈনন্দিন কাজ-কর্মের প্রয়োজনে বিকারী মানুষের সাথে যদি থাকতেই হয় তাহলে চেষ্টা করে নিজের

মনকে সত্যস্বরূপ পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গ বা স্মৃতিতে রাখার প্রয়াস করতে হবে। স্মৃতিতে থেকে জ্ঞান যোগাদির চর্চা করতে হবে যাতে বাতাবরণে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থাকে।

অশ্লীল বইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে এছাড়া সিনেমা, মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে এরূপ আলোচনা সভা বা ব্যক্তির সঙ্গ থেকে নিজেকে শত যোজন দূরে রাখতে হবে। কারণ এধরণের সঙ্গের জন্য বহু খারাপ বিষয় মনের মধ্যে গেঁথে যায় যা পরবর্তীকালে নিজের জীবন থেকে মুছে ফেলা দুরূহ হয়ে ওঠে। এছাড়াও যেসব পুস্তকে দেবী দেবতার গ্লানি করা হয়েছে, দেবী দেবতার বিকারের অস্তিত্ব উল্লেখ করা হয়েছে এসব পুস্তককে মিথ্যা এবং অশ্লীল ভেবে দূরে রাখা উচিত। ধর্মগ্রন্থের রূপেও যদি পরিবেশিত হয় তাও একই দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে হবে।

৪. প্রতিদিন জ্ঞান গঙ্গায় স্নান

পূর্বে উল্লিখিত নিয়মাদি পালনের সাথে সাথে অতিরিক্ত

আমাদের প্রতিদিন জ্ঞান-স্নান করা আবশ্যক। যেমন স্থূল স্নানে শরীরের ময়লা দূর হয় তেমনি জ্ঞান-স্নানের দ্বারা আত্মার ময়লা দূর হয়ে দৈবগুণ অর্জিত হয়। বিপথে না যাওয়ায় সতর্কতা মেলে উপরন্তু পবিত্র থাকার এবং যোগ-যুক্ত হওয়ার প্রেরণা পাওয়া যায়। ভগবান প্রদত্ত 'জ্ঞান' (মুরলী) জলের মত সহজ সরল নির্মল তাই ভক্তিমার্গে গঙ্গাজল বলে উল্লিখিত হয়। যদি কোন কারণে জ্ঞান স্নান করার জন্য জ্ঞান কক্ষে (Class room) আসা সম্ভব না হয় তাহলে পরমপিতা পরমাত্মা শিব প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্মিত কিছু লেখা, পত্রিকা বা বই অধ্যয়ন এবং মনন-চিন্তন অবশ্যই করা উচিত।

ঠিক এভাবে যদি উপরোক্ত কথিত বা অন্যান্য ঈশ্বরীয় নিয়মে আমাদের জীবনযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাই এবং ঈশ্বর প্রদত্ত কর্মের গহণ গতির জ্ঞান যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের জীবন অবশ্যই হীরে-তুল্য হবে।

দিনলিপি / দিনকৃতি

পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে যে তিন ঈশ্বরীয় যুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তা আচরণে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য আন্তরিক পুরুষার্থ করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে পুরুষার্থে কতখানি সফলতা প্রাপ্ত হয়েছে। নীচে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নমালাকে স্ব-উন্নতির একটি মানদন্ড ধরে নেওয়া যেতে পারে। এভাবে নিজেকে পরখ করা হলে স্ব-উন্নতির পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হবে।

(১) ক) আপনি আজ ঈশ্বরীয় স্মৃতিতে বিশেষ রূপে কতক্ষণ বসেছেন?

খ) দৈনন্দিন কাজ-কর্মের মধ্যে ব্যস্ত থেকে কত সময় ঈশ্বরের স্মরণে থেকেছেন?

(২) যোগে আপনার স্থিতি সাধারণ, ভাল, উত্তম কোনটা ছিল?

(৩) আপনি কত সময় ধরে জ্ঞানের মনন-চিন্তন করেন?

(৪) ক) আজ আপনি কোন্ বিশেষ দিব্যগুণ ধারণের পুরুষার্থ করেছেন?

খ) যদি পুরুষার্থ করে থাকেন তাহলে সফলতা মিলেছে কি?

(৫) ক) আপনি পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, ভোজন এবং নিদ্রা প্রভৃতির পূর্বে ঈশ্বরীয় স্থিতিতে স্থিত হয়ে নিয়মাদির পালন সন্তোষজনক রীতিতে করতে পেরেছেন কি?

খ) কোন নিয়মকে আজ আপনি পালন করতে পারেননি?

(৬) ক) আপনি কি অন্যকে কোনও ঈশ্বরীয় সেবা করেছেন?

খ) আজ আপনি কি কাউকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান শুনিয়েছেন, ঈশ্বরীয় সেবার্থে কিছু ধন দান করেছেন বা যোগ দ্বারা সেবা করেছেন?

(৭) ক) আপনার মনে তো কোন বিকার আসেনি?

খ) যদি এসেই থাকে তা মন পর্যন্ত না বচনে না কর্মে তা প্রতিফলিত হয়েছে?

গ) আপনি কি ঐ বিকারের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছেন? যদি করে থাকেন তো তাহলে নিজের জ্ঞান

বল অথবা যোগবল বা অন্য কোন্ শক্তিশালী পুরুষার্থ দ্বারা তাকে নিবৃত্ত করেছেন?

খ) যদি বিকারে কাছে আপনার হার হয়ে থাকে তাহলে তা কোন্ কারণে?

(৮) ব্যর্থ সংকল্পে বা ব্যর্থ কর্মে আজ আপনি কিছুটা সময়ও তো ব্যয় করেননি?

ওম্ শান্তি

Supreme God Father

The Ocean of Purity,
Peace, Bliss & Happiness

Website : www.brahmakumaris.com